ধারাবাহিক রচনা

হিমালয়পথে : তমসা উপত্যকা ও অচেনা হানোল

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

এ-পর্যন্ত হিমালয়ের যত গ্রাম দেখেছি তাদের মধ্যে জাখোল গ্রামকে সবার থেকে আলাদা লেগেছে। বাড়িঘর অনেকটা সওর গ্রামের মতো হলেও, নানা অমিলও দেখেছি। এখানে প্রাচীনত্বের চিহ্ন যেন অনেক বেশি প্রকট—মানুষের হাবভাব, চেহারা ও পোশাক-আশাকের ক্ষেত্রেও, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে। এছাড়া জনবসতি আরও ঘন, চোখ টানে পাহাড়ের ঢালে অনেকটা অংশ জুড়ে সারিসারি কাঠের বাড়ি। গ্রামের ভিতরে ঢুকতে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। রাস্তার পাশেই কিছুটা নিচে প্রশস্ত একটি জায়গায় নারীপুরুষ মিলে গম-ঝাড়াই করছে—আর সে-কাজে তারা লাগিয়েছে ঘোড়া ও অশ্বেতর পশুকে। নানা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পৌঁছে গেলাম জাখোলের মন্দির প্রাঙ্গণে। আকার ও আয়তনে সওর গ্রামের মন্দিরের প্রায় অনুরূপ—সম্ভবত কিছুটা বড় এবং জমকালো। মন্দিরের দেবতা সোমেশ্বর। শুনলাম আশু উৎসবের কথা এবং দেবতার বিভিন্ন গ্রাম প্রদক্ষিণের সংবাদও। ঘুরে ঘুরে দেখলাম কাঠ ও পাথর দিয়ে তৈরি মন্দিরের কারুকাজ, নানা মাপ ও চেহারার পশুপক্ষীর মূর্তি মন্দিরের গায়ে ও বিশেষত ছাদে। এটি এখানকার সব মন্দিরেরই বৈশিষ্ট্য। ফেরার পথে কয়েকজন শিক্ষিকার সঙ্গে পরিচয় হল। তাঁরা সরকারি আনন্দ-পাঠশালার সঙ্গে যুক্ত, কাছেই দেখলাম সেই স্কুল ও কৌতূহলী চোখে শিশুর দল। ঘণ্টা তিনেক ছিলাম জাখোলে। একটি প্রশ্ন খুবই ভাবাচ্ছিল সাঁকরি থেকেই, সে-বিষয়ে উল্লেখ না করলে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভাব কীভাবে অঞ্চলভিত্তিক প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কারের উপর ছাপ ফেলছে তা জানা যাবে না।

আকৈশোর অগ্রজ ভ্রমণার্থীদের কাছ থেকে জেনে এসেছি তমসা উপত্যকায় সাঁকরি ও

তমসা নদী

সওর গ্রামের বাড়ি

তৎসংলগ্ন এলাকায় দুর্যোধন পূজিত হন দেবতা হিসেবে, পাশাপাশি অনেকস্থানে কর্ণের পূজার সংবাদও জেনেছি। বহু গ্রন্থ ও রচনাদিতেও এই উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলাম দুর্যোধনের কথা কেউ এখানে বলছেন না, বলছেন সোমেশ্বর দেবতার কথা—কী সওর, কী জাখোল, দু-জায়গাতেই। এছাড়া দুজায়গাতেই দেখলাম 'দুর্যোধন' নামের উল্লেখে সবার মধ্যে যেন একটি অস্বস্তি, এবং কিছুটা দ্রুততার সঙ্গে অন্য দেবতার প্রসঙ্গও। এটি আমাকে অবাক করেছিল। এ-ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলা দরকার। প্রথমে দুর্যোধন-পূজার পশ্চাৎপট।

হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু পৌরাণিক বা প্রাচীন ঐতিহাসিক জাতির অধিবাসী দেখা যায় যাদের অভ্যুদয় বৈদিক ও মহাকাব্যিক যুগের আগে। নির্ভরযোগ্য বা ধারাবাহিক তথ্যের অভাবে আজ আর সেসব মানুষের উদ্ভব বা আদি ধর্মীয় পরিচয় নিরূপণ করা সম্ভব নয়। আমাদের আলোচিত অঞ্চলের মানুষেরা এই গোষ্ঠীতে পড়েন। গবেষণামূলক গ্রন্থাদিতে সে-উল্লেখ আছে। তমসা উপত্যকার এই ঊর্ধ্বাংশটি পশ্চিম-হিমালয়ের অন্তর্গত, এখানে বিভিন্ন জাতির মধ্যে খাসা (Khasas) বা খাসিয়ারা (Khasiyas) সংখ্যায় প্রভূত। এরা আর্যবংশোদ্ভূত যাদের উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যাদি—যেমন রামায়ণ ও মহাভারত এবং পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। খাসারা মহাভারত যুদ্ধে কৌরবদের অনুগামী হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কালক্রমে দুর্যোধনকেই তারা তাদের রক্ষাকর্তা সাব্যস্ত করে, ফলে কর্ণকেও তারা দেবতার আসন দেয় তাঁর বহুবিধ ঔদার্যের ভিত্তিতে। এই ইতিহাসই নিশ্চিত এখানকার জনজীবনেও সুদূরপ্রসারী প্রভাব রেখে গেছে। জাখোল থেকে প্রতি বছর আষাঢ় মাসের ২১ তারিখ শ্রদ্ধাভরে তাদের রক্ষাকর্তা দেবতাকে বহন করে প্রথমে মোরি জেলার ফিতারি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়; তারপর সেখান থেকে কোটেগাঁও, ডাটমির হয়ে দিন কুড়ি পরে ধুমধামের সঙ্গে এক বর্ণময় ডোলি যাত্রায় ওসলা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। বিগ্রহটি আবার ধুমধামের সঙ্গে জাখোল ফিরে যায় পৌষের ১৫ তারিখ। সেখানে তখন শুরু হয় আর এক উৎসব—গানবাজনা করে তাঁকে বরণ করে নেয় জাখোলের অধিবাসীরা। এই উৎসবের ঠিক একমাস আগে আমরা সওর গ্রামে গিয়েছিলাম। সেখানকার মানুষ জানিয়েছিলেন যে সওর নয়—জাখোলই দেবতার আবাসস্থল। কিন্তু তাঁরা দুর্যোধনের কথা আমায় বলেননি, বলেছিলেন সোমেশ্বর দেবতার কথা। কিন্তু কেন? ইংরেজি 'হিন্দু' পত্রিকার ই-পেপারে ১১ মে ২০১৭ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, অধুনা টেলিভিশনে মহাভারত কাহিনির সর্বভারতীয় প্রচারের ফলে টন্‌স উপত্যকায় দুর্যোধনের অনুগামীরা বুঝতে পারেন যে তাঁদের রক্ষাকর্তার বীর

অপেক্ষা একটি দুরাত্মা ভাবমূর্তিও রয়েছে। ফলে তাঁদের গোষ্ঠীর মধ্যে একটি বিভাজন শুরু হয়—বেশ কিছু মানুষ ক্রমে নিজেদের অবস্থানের পরিবর্তন করতে শুরু করেন। সম্ভবত একেই টন্‌স উপত্যকায় সোমেশ্বরের আবির্ভাব কাহিনি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। তবে আমার ধারণা, যুগাতীত কাল থেকে বহমান ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতি যে-কোনও সমাজের এত গভীরে স্থান করে নেয় যে, কোনও বাহ্যিক প্রভাবের ফলে তার আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই—এমনকী সেই সমাজের একটি অংশ সেই প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতে প্রয়াসী হলেও নয়। তাহলে দুর্যোধনের পূজার ব্যাপারে এই নীরবতা, এমনকী অস্বীকারের কারণ কী? এবারেও আমার ধারণার কথাই বলি—বহিরাগত ভ্রমণার্থী ও অভিযাত্রীদের থেকে নিজেদের এই ব্যতিক্রমী আনুগত্য ও ভক্তির দিকটি সাঁকরি ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের মানুষ আড়ালে রাখতে চাইছেন—আর কিছু নয়। মহাভারত থেকে আর একটি স্বল্পজ্ঞাত কাহিনির কথা বলব—নইলে একটি দীর্ঘ নদী, সৌন্দর্যে যে অতুলনীয়া—তার দুর্ভাগ্যের কথা অজানা থেকে যাবে।

সাঁকরির রাস্তায় নৈটোয়ারের কথা বলতে গিয়ে সেখানকার কর্ণ এবং পোখু দেবতার মন্দিরের উল্লেখ আগে করেছি। দ্বিতীয়োক্ত মন্দিরটি রুপিন ও সুপিনের সংগমের কাছেই, রাস্তা থেকে কিছুটা নেমে গিয়ে। তমসা নদীর সেটিই উৎসমুখ। মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, তার পিছনে পোখু দেবতার কামরা। সে-মূর্তি কাউকে দেখানো হয় না, শোনা যায় সেটি নাকি অত্যন্ত ভীতিপ্রদ। এমনকী স্বয়ং পুরোহিতও দেবতার দিকে পিছন ফিরেই পূজা করেন। শিবলিঙ্গটির প্রতিষ্ঠা শংকরাচার্যের পরবর্তী সময়ের ঘটনা হিসেবে উল্লিখিত হলেও, এটি আধুনিক কালের সংযোজন বলেই মনে হয়। কারণটি দুর্যোধন মন্দিরাদির প্রসঙ্গে ইতঃপূর্বে আলোচিত। পোখু দেবতাকে এই অঞ্চলে ন্যায়ের দেবতা হিসেবে মানা হয়, সুপ্রাচীন কাল থেকে এখানকার মানুষের বিশ্বাস যে ন্যায়বিচারের জন্য কেউ তাঁর কাছে গেলে বিফল হয়ে ফেরে না। ফলে ন্যায়ালয়ে যাওয়ার আগে এখানকার মানুষ যুগ যুগ ধরে এই দেবতার শরণাপন্ন হন। প্রত্যহ বহু মানুষ দর্শনে আসেন—শোনা যায় এই অঞ্চলে সামাজিক অপরাধের হারও অত্যন্ত কম। তার জন্য অবশ্যই পোখু দেবতার মাহাত্ম্য স্বীকৃত। এখানকার প্রত্যেক গ্রামেই তাঁর পূজা হয়, প্রতীক হিসেবে কাস্তে ও ছুরি ব্যবহৃত হয়। মন্দিরকে কেন্দ্র করে জুন ও আগস্ট মাসে প্রতি বছর মেলাও বসে।

পোখু দেবতাকে ঘিরে এবার আঞ্চলিক গাথার কথা বলি। একসময় কিরমির নামে এক রাক্ষস এই অঞ্চলের মানুষকে উৎপীড়ন করতে শুরু করে। দুর্যোধন এগিয়ে আসেন রক্ষাকর্তা হিসেবে। লড়াই করে তিনি তাকে পরাস্ত করেন এবং তার মাথাটি কেটে টন্‌স নদীর জলে নিক্ষেপ করেন।* কিন্তু স্রোতের টানে ভেসে না গিয়ে সেই মস্তক টন্‌স নদীর উৎসস্থল রুপিন-সুপিনের সংগমে এসে স্থিত হয়। এই দেখে দুর্যোধন এস্থানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কর্তিত মস্তকটিকে সেখানে স্থাপন করেন। এটিই সেই মন্দির। আর একটি লৌকিক উপাখ্যান অনুযায়ী এই মন্দির কিরমির দৈত্যের নয়, অর্জুনপুত্র বভ্রুবাহনের—মহাভারত যুদ্ধ শুরুর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ যার মস্তক ছেদন করেন। অন্যত্র অর্জুন-উলুপীর পুত্র ইরাবান সম্বন্ধেও আমরা যুদ্ধপূর্বে

* এটিই আঞ্চলিক বিশ্বাস। লক্ষণীয়, এখানে রাক্ষসনিধনের কৃতিত্ব দুর্যোধনকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মহাভারতের কাহিনি অনুযায়ী কিরমিরকে হত্যা করেন ভীম। পাশাখেলায় পরাজয়ের পর রাজ্য ছেড়ে কাম্যক অরণ্যে প্রবেশের সময় এই কিরমির দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডবকে বাধা দিলে ভীম তাকে পরাভূত করেন।

আত্মহত্যার অনুষঙ্গ পাই। এই দুটি জীবনাবসানের পিছনেই যুদ্ধপূর্বে সর্বসুলক্ষণযুক্ত এক পুরুষের বলিদানের প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। একই ইঙ্গিত পেয়েছি বারবারিকের কাহিনির পিছনেও। তবে সব মিলিয়ে বারবারিকের কাহিনিটিকেই নৈটায়ারের মন্দির প্রসঙ্গে অধিক গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। কারণ হিমালয়কেন্দ্রিক এক গবেষণাগ্রন্থে উল্লেখ পেয়েছি, এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে একটি ছিন্ন মস্তক নৈটায়ারে নিয়ে এসেছিল। আঞ্চলিক বিশ্বাস বা গাথার বিচারে যাব না। তবে এই আখ্যানের সঙ্গে বভ্রুবাহন বা ইরাবান অপেক্ষা মহাভারতের অন্য এক উপাখ্যানের সাদৃশ্য আছে। কেন, সেই কথা বলি।

প্রথমে কাহিনির ভিতরে কাহিনির সন্ধানে স্কন্দপুরাণের সাহায্য নেব। সেখানেই আমাদের আখ্যানের নায়ক মহাবল ভীমের নাতি বারবারিকের প্রথম উল্লেখ আছে। সে ঘটোৎকচ ও তাঁর স্ত্রী মৌরভির পুত্র, পূর্বজন্মে যে ছিল যক্ষ। একদা দানবদের অত্যাচারে অসহায় দেবতাগণ সাহায্যের অভিলাষে বিষ্ণুর কাছে যান। সেইসময় সেখানে উপস্থিত ছিল এই যক্ষ। সে তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে যে এর জন্য বিষ্ণুর সাহায্যের প্রয়োজন নেই, সে একাই যথেষ্ট। তার উদ্ধত বাক্যে ব্রহ্মা রুষ্ট হন। তিনি তৎক্ষণাৎ যক্ষকে অভিশাপ দিয়ে বলেন যে সে পরবর্তী জন্মে বিষ্ণুর হাতেই নিহত হবে। পরজন্মে ঘটোৎকচের সন্তান হিসেবে যক্ষের জন্ম হয়—নাম হয় বারবারিক। মহাভারত যুদ্ধের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের হাতে বারবারিকের নিধনের কাহিনিটির আপাতসাদৃশ্য সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে সেটির মধ্যে কিছু তারতম্যও দেখা যায়। সে আলোচনায় না গিয়ে আমরা কেরালা ও অন্ধ্রপ্রদেশে প্রচলিত আখ্যানটির সাহায্য নেব।

মহাভারত যুদ্ধের আঠারো দিন অতিক্রান্ত। বিজয়ী পাণ্ডবদল শিবিরে ফিরে এসেছেন। তাঁরা শ্রান্ত হলেও যুদ্ধজয়ের আনন্দে মত্ত। এরই মধ্যে সৈন্যদলের মধ্যে প্রশ্ন উঠল, এ-যুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ বীর হিসেবে কে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। নাম উঠল কর্ণের, ভীমের এবং অবশ্যই অর্জুনের—কিন্তু কেউ সহমত হলেন না। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, ''এই উত্তর যদি এত জরুরি তাহলে যাও সেই কথা-বলা মুণ্ডের কাছে।'' এই কথা-বলা মুণ্ডই ছিল বারবারিক। এই বীর বারবারিক মাত্র তিনটি বাণ নিয়ে এসেছিলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে। শ্রীকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন, একটিমাত্র বাণ দিয়ে তিনি সমগ্র পাণ্ডবকুলকে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন, অপরটি দিয়ে কৌরবকুলকে, এবং তৃতীয়টি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে। পরীক্ষা নিতে সর্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নির্দেশ দেন নিকটস্থ একটি বিশাল অশ্বত্থগাছের প্রতিটি পাতায় শরাঘাত করতে। উপস্থিত সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, একটিমাত্র বাণ মুহূর্তের মধ্যে সেই বৃক্ষের সকল পত্র বৃন্তচ্যুত করার পর ফিরে এসে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগলের চারিধারে চক্রাকারে ঘুরছে। কারণ তিনি আগেই গাছের কয়েকটি পাতা পায়ের নিচে লুকিয়ে রেখেছিলেন পরীক্ষার অঙ্গ হিসেবে।

বারবারিকের বীরত্বের পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে জানতে চাইলেন কার হয়ে তিনি যুদ্ধ করতে চান। বারবারিক বলেছিলেন, তিনি শুধু যারা হারছে তাদের হয়েই লড়াই করতে পারেন—তা না হলে তাঁর অপরাজেয় শক্তি কার্যকরী থাকবে না। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন বিপদ, হারা দলের হয়ে যুদ্ধ শুরু করলেও যে-পক্ষে বারবারিক থাকবে সে পক্ষের জয় অনিবার্য, সুতরাং তখনই নিজের শক্তি বজায় রাখতে তাঁকে আবার দল পরিবর্তন করতে হবে। এইভাবে তাঁকে ক্রমাগত একবার কৌরব, আর একবার পাণ্ডবপক্ষের হয়ে যুদ্ধ করতে হবে—সুতরাং যুদ্ধ শেষ হবে না, অনন্তকাল ধরে তা চলতে থাকবে। এই সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য তিনি এক উপায় ঠিক করলেন। বারবারিকের কাছে তিনি

সাহায্য প্রার্থনা করলেন। বললেন যে এক যোদ্ধাকে নিয়ে তিনি খুবই চিন্তিত—সে পৃথিবীর ত্রাসের কারণ। জানতে চাইলেন বারবারিক কি তাঁকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করবেন? অসহায়ের অনুরোধ রক্ষায় বারবারিক কখনও পিছপা হননি, জানতে চাইলেন কে সেই যোদ্ধা যে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তার কারণ; কথা দিলেন, জানতে পারলে তাকে তিনি তখনই নিধনে প্রস্তুত। শ্রীকৃষ্ণ বারবারিকের মুখের সামনে একটি আয়না ধরলেন, বললেন এই যোদ্ধার মাথা আমার চাই। বারবারিক বুঝলেন যে নিজের প্রতিজ্ঞার জালে তিনি বদ্ধ হয়েছেন, বুঝলেন শ্রীকৃষ্ণের ছল। তথাপি তিনি নিজের মাথাটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদন করলেন। তবে তার আগে শুধু একটি দুঃখের কথা জানিয়েছিলেন—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তিনি দেখতে পেলেন না। সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর খণ্ডিত মস্তকে প্রাণ আরোপিত করে সেই মস্তকটি নিকটবর্তী একটি পর্বতগাত্রে স্থাপিত করলেন—যেখান থেকে সম্পূর্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বারবারিক অবলোকন করতে পারবেন। তাই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে পাণ্ডবপক্ষের আগ্রহী সৈন্যদল যখন কয়েকজন স্বীকৃত মহারথীর নাম উল্লেখ করে সেই মস্তক-সর্বস্ব বারবারিকের কাছে জানতে চেয়েছিল—কে সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরযোদ্ধা—উত্তরে তিনি বলেছিলেন—কই, কর্ণ, অর্জুন, ভীম—আমি তো কাউকে দেখিনি, বস্তুত সারা কুরুক্ষেত্র সমরে আমি কোনও যোদ্ধাই দেখিনি। আমি শুধু দেখেছি শোঁ শোঁ শব্দে চতুর্দিকে তীব্র গতিময় সুদর্শনচক্র নীতিহীন, ন্যায়বিরোধী রাজন্যদের মস্তকছেদনে নিরত, তাঁদের বিচ্ছিন্ন শরীর থেকে নির্গত শোণিতধারায় পৃথ্বী সিক্ত, আর সেই শোণিতের গতি মহাকালীর জিহ্বামুখী!

লোককাহিনি অনুযায়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধশেষে দীর্ঘদিন একাকী এই পর্বতগাত্রে বিষণ্ণ কালাতিপাতের পর বারবারিকের ঠাঁই হয়েছিল নৈটায়ারের পর্বতশীর্ষে—টন্‌স নদীর উৎসমুখে। তারপর থেকে তাঁর নয়ননির্গত বেদনাশ্রু অবিরত গিয়ে মিশছে এই নদীতে। তাই উৎসমুখ থেকে সারা যাত্রাপথে টন্‌স নদীর জলে কোথাও কোনও গার্হস্থ্যকর্ম অথবা কৃষিকার্য হয় না।

জাখোল থেকে দুপুর নাগাদ ফিরে এলাম সাঁকরিতে। তিনদিন কাটিয়ে চতুর্থদিন সকালে সাঁকরি ত্যাগ করি। একটি গাড়ি ঠিক করা ছিল, দেরাদুন থেকে এসে আমাদের নিয়ে যাবে। ঠিক ছিল একরাত্রি মুসৌরির ল্যানডৌর এলাকায় পাহাড়ের মাথায় একটি নিরালা হোমস্টে-তে থাকব—তারপর সেখান থেকে হরিদ্বার পৌঁছে গাড়ি ছেড়ে দেব। কিন্তু আচমকা ছোট ও মাঝারি গাড়ি চলাচলের ধর্মঘট হওয়ায় সাঁকরি থেকে বাসেই হরিদ্বার ফিরতে হয়েছিল, ফলে মুসৌরিতে থাকা হয়নি। হরিদ্বার পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যা নাগাদ। হরিদ্বারে হাতে একটি-দুটি দিন থাকলে পায়ে পায়ে ঘুরি—এবারেও তাই করলাম। ঘুরে ঘুরে দেখি প্রথমবার এসে কোথায় উঠেছিলাম, তার পরের বারই বা কোথায়। বাজার-দোকানের নানা পরিবর্তন লক্ষ করি—দু-একটি প্রাচীন দোকান এখনও চোখে পড়ে। কাঁচাপাকা চুলের ব্যস্ত-হাত মালিককে তাকিয়ে দেখি, চকিতে মনে পড়ে যায় তার কিশোর বয়সের চেহারাটি—তখন সে তার বাবাকে সাহায্য করত। তারপর গিয়ে দাঁড়াই বিষ্ণুঘাটে—আমাদের অতি প্রিয় জায়গা। তীব্র গতিতে গঙ্গা সেখানে সমতলগামী। মানুষ সারাদিন স্নান করছে, কতজন ঘাটে বসে আছে আপনমনে। সাঁতরে, বারবার ডুব দিয়ে দুরন্ত ছেলের দল নদীতল থেকে পয়সা তুলে নিয়ে আসছে—ভেসে আসছে ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালার বাঁশির শব্দ—শেষ নাহি যে, শেষকথা কে বলবে! ✠ *সমাপ্ত*